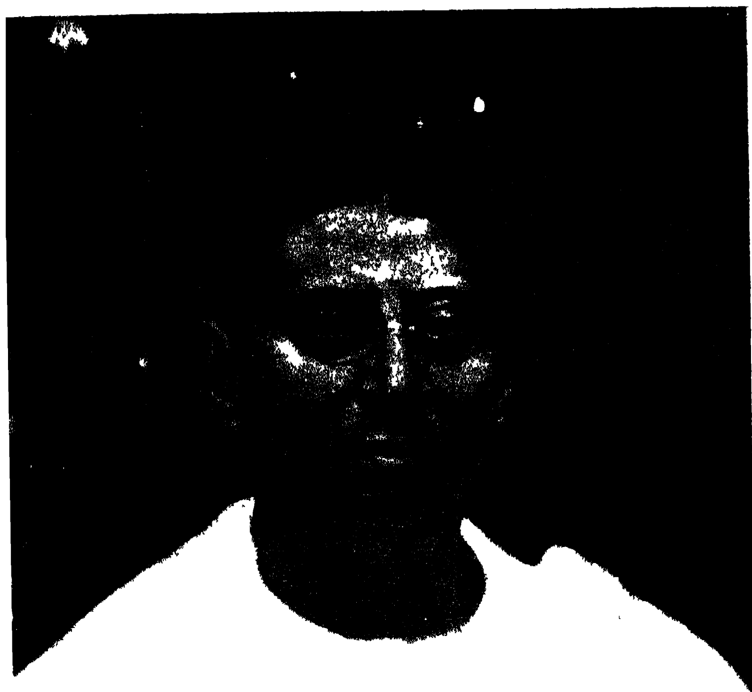
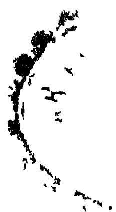
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত



দেব সাহিত্য-কুটীর

জীবনচরিতাবলী—৩০শ গ্রন্থ

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন



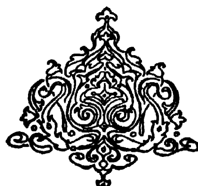
'হেনরী ফোর্ড', 'স্যর রাজেন্দ্রনাথ', 'শিলাদিত্য', 'মহারাজ গুহ', 'বাপ্পাদিত্য', 'সমরসিংহ', 'লক্ষ্মণসিংহ', 'হামির', 'চণ্ড', 'রাণা কুম্ভ', 'রাণা সঙ্গ', 'বনবীর' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি-এস্-সি

প্রণীত

দাম—তিন আনা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।



পুনর্মুদ্রণ
বৈশাখ—১৩৫০

প্রিণ্টার—এস্, মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

স্বদেশ ও স্বজাতির মর্ম্মবেদনায় যাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরিত, দেশ-জননীর আহ্বানে যিনি ভোগ-ঐশ্বর্য্যের মায়া অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী সাজিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করেন নাই, স্বদেশ-সেবার বেদীমূলে যিনি আপনাকে নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়া দেশবাসীর মনে অমর হইয়া রহিয়াছেন, ত্যাগ ও নিষ্ঠার দ্বারা যিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত কর্ম্ম-জীবনকে মহিমার দীপ্তিতে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আজ তোমাদিগকে তেমনই এক জন স্বদেশ-প্রেমিকের জীবন-কথা বলিব। তিনি আমাদের পরম গৌরব দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন।

জন্ম

বাংলার পূর্ব্বপ্রান্তে প্রকৃতির লীলানিকেতন চট্টল ভূমি। ইহার চরণ-তলে উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গ-ভঙ্গে লুটাইয়া পড়িতেছে, শিরোদেশে পর্ব্বতমালা মুকুট-শোভা রচনা করিয়াছে, বক্ষে কলনাদিনী তরঙ্গিণী হার দোলাইয়া দিয়াছে; বিহগ-ঝঙ্কৃত শ্যামল বনরাজি ইহাকে নীলাম্বর পরাইয়া দিয়াছে, রজত-শুভ্র গিরি-প্রস্রবণ অবিরাম ইহার বন্দনা-গীতি গাহিতেছে। প্রকৃতির এই রম্য কাননের এক নিভৃত অংশে ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম—নাম বরমা।

ইংরেজী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী, বাংলা ১২৯১ সালের ১১ই ফাল্গুন, এই বরমা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশে যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ১৮৮৫

খৃষ্টাব্দ এক স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরেই ভারতের জাতীয় রাষ্ট্র-মহাসভা কংগ্রেসের জন্ম হয়।

যতীন্দ্রমোহন পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার পিতার নাম যাত্রামোহন সেনগুপ্ত এবং মাতামহের নাম ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর।

মাতামহ ডাক্তার খাস্তগীর

যতীন্দ্রমোহনকে বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পিতা ও মাতামহের কথা জানিতে হয়। যে সময় লোকে চট্টগ্রামকে 'মগের মুলুক' বলিয়া জানিত, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর স্বীয় প্রতিভা, হৃদয়ের উদারতা ও চরিত্র-মাধুর্য্যে শুধু বাংলায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ষেই সুপরিচিত হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ তিনি স্ত্রী-শিক্ষা, চিকিৎসা ও শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি সমুদয় জন-হিতকর কার্য্যে অগ্রণী হইতেন। কলিকাতার বেলগাছিয়া মেডিক্যাল স্কুল (বর্ত্তমানে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ) ডাক্তার খাস্তগীরের অক্ষয় কীর্ত্তি।

তাহার প্রথমা কন্যা সিভিলিয়ান মিঃ বি. এল্. গুপ্তের সহধর্ম্মিণী, দ্বিতীয়া কন্যা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ এবং তৃতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা বিনোদিনী দেবী যতীন্দ্রমোহনের জননী। বিনোদিনী পিতার নিকট হইতে যে উদারতা লাভ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা তাঁহার পুত্র যতীন্দ্রমোহনের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছিল।

পিতা যাত্রামোহন

যাত্রামোহন চট্টগ্রামের স্বনামধন্য কীর্ত্তিমান্ পুরুষ। অতি সামান্য অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় অসামান্য অধ্যবসায় ও পুরুষকার দ্বারা তিনি পরবর্ত্তী জীবনে অতুলনীয় সাফল্য অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কি আইন-ব্যবসায়ে, কি স্বদেশ-প্রীতিতে, কি সমাজ-সেবায়—সকল দিক্ দিয়াই তিনি চট্টগ্রামের গৌরব-স্তম্ভ ছিলেন। সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন এক জন অক্লান্তকর্ম্মা দেশ-সেবক। যতীন্দ্রমোহন পিতার চরিত্রের এই মহৎ আদর্শ হইতেই অকৃত্রিম স্বদেশ-সেবায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

যাত্রামোহন বার বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। একে দরিদ্রের সন্তান, তদুপরি এত অল্প বয়সে পিতাকে হারাইয়া তিনি একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়েন। সাধারণ ছেলে হইলে যাত্রামোহনের জীবন হয়ত এখানেই ব্যর্থ হইয়া যাইত; কিন্তু বড় হইবার জন্যই যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের ভিতরে যে শক্তির বীজ লুক্কায়িত থাকে, সহস্র ঝড়-ঝঞ্ঝায়ও তাহা বিনষ্ট হয় না। তাই পিতার মৃত্যুতেও একেবারে হতোদ্যম না হইয়া তিনি এক আত্মীয়ের গৃহ-শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন ও তাহাতে যে সামান্য আয় হইত, তাহা দ্বারাই কোন প্রকারে স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

এ ভাবে স্বগ্রামের স্কুল হইতে মাইনর পাশ করিয়া তিনি সহরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এখানেও গৃহশিক্ষকের কাজ করিয়াই তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। এত সব অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাইয়াও তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এ সময়ে ডাক্তার খাস্তগীর চট্টগ্রামে যাত্রামোহন যে স্কুলে পড়িতেন, সেই স্কুলটি পরিদর্শন করেন। তিনি বহু গরীব ও মেধাবী ছাত্রকে অর্থ-সাহায্য করিতেন। স্কুলের শিক্ষকদের নিকট তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, যাত্রামোহন সে স্কুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র এবং নিয়মিত পড়াশুনা করিতে পারিলে কলেজেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন, তখন তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় গিয়া কোন কলেজে ভর্ত্তি হইতে উপদেশ দেন। যাত্রামোহন তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং যথাসময়ে সবিশেষ কৃতিত্বের সহিত এফ্-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অন্নদাচরণ যাত্রামোহনের পাঠানুরাগ, অধ্যবসায় ও চরিত্র-মাধুর্য্যে তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার এই স্নেহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অবশেষে তিনি তাঁহার হস্তে কনিষ্ঠা কন্যা বিনোদিনীকে সমর্পণ করিয়া সে স্নেহের সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও মধুর করিয়া তুলিলেন।

বি-এ পাশ করার পর যাত্রামোহন আইন পড়িতে আরম্ভ করেন এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর অন্নদাচরণ তাঁহাকে কলিকাতায়ই ওকালতি আরম্ভ করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাব যাত্রামোহনের মনঃপূত হইল না। তিনি চট্টগ্রামে ওকালতি করা স্থির করিলেন এবং ডাক্তার খাস্তগীরও অবশেষে জামাতার মতেই মত দিতে বাধ্য হইলেন।

সে সময় চট্টগ্রামে বহু প্রতিষ্ঠাবান্ ও বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী ছিলেন। কিন্তু যাত্রামোহন স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অপরিসীম খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার গভীর আইন-জ্ঞান, মোকদ্দমা পরিচালনা-

কৌশল ও সওয়াল-জবাবের নৈপুণ্য বিচারকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

যাত্রামোহনের কর্ম্মজীবন কেবল আইনের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। পরন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার কর্ম্ম-প্রতিভা সমভাবে বিকশিত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে চট্টগ্রাম রাজনৈতিক বিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। তাই তিনি নানা উপলক্ষে স্যার সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদিগকে চট্টগ্রামে আহ্বান করিয়া আনিতেন।

রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী হিসাবে তিনি তাঁহার সহিত বাংলার বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বহু দিন পর্য্যন্ত তিনি সুরেন্দ্র-নাথের একজন অকৃত্রিম ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে সুরেন্দ্রনাথ মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার সমর্থন করিলে তাঁহার সহিত যাত্রামোহনের মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন চরমপন্থী এবং সে আদর্শ নিয়াই তিনি আজীবন দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

চট্টগ্রামের নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও তিনি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। চট্টগ্রামের জে. এম্. সেন হল, জে. এম্. সেন হাই স্কুল, তাঁহার মাতাপিতার নাম অনুসারে ত্রাহি-মেনকা হাই স্কুল, খাস্তগীর উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়, তাঁহার স্বগ্রাম-স্থিত মধ্য-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। কিন্তু দেশবাসীর নিকট তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন'।

বাল্যজীবন ও শৈশব-শিক্ষা

যতীন্দ্রমোহন তাঁহার পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহারা আট ভাই ও পাঁচ বোন। ভাইদের মধ্যে বর্ত্তমানে চার জন ও ভগিনীদের মধ্যে মাত্র একজন জীবিত আছেন। যতীন্দ্রমোহনের যখন জন্ম হয়, তাঁহার পিতা তখন ওকালতী ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। ধনীর দুলাল যতীন্দ্রমোহনের শৈশব পরম আদর ও যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। ছয় বৎসর বয়সে তিনি হাজারী মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তথাকার পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি কিছুকাল কলিকাতায় ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় চট্টগ্রামে গমন করেন এবং কিছু দিন তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার পর পুনরায় কলিকাতা আসিয়া প্রথমে সাউথ সুবারবান্ স্কুলে এবং পরে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন।

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি

বাল্যজীবনেই যতীন্দ্রমোহনের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশব-সুলভ চপলতা বশতঃ তিনি অধিকক্ষণ পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না, বেশীর ভাগ সময়ই সমবয়স্ক সহপাঠীদের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকিতেন। কিন্তু যে সামান্য সময়টুকু বই লইয়া বসিতেন, তাহাতেই তাঁহার কাজ হইত। তাই স্কুল-জীবনে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারিলেও তাঁহার প্রমোশন পাওয়া বন্ধ হয় নাই।

নেতৃত্বের প্রথম অঙ্কুর

যতীন্দ্রমোহন যে ভবিষ্যৎ জীবনে জাতির মুক্তি-সংগ্রামে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করিবেন, বাল্যজীবনেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। স্কুলে তিনি দলপতির ন্যায় সমপাঠীদের নিকট নিজ কর্ত্তৃত্ব জাহির করিতেন। এই জন্য তিনি তাহাদের নিকট হইতে 'ওস্তাদ্‌জি' আখ্যা পাইয়াছিলেন। নিত্য নিত্য নূতন নূতন খেলার উদ্ভাবন করিয়া তিনি তাঁহার কিশোর দলটির মনোরঞ্জন করিয়া নিজের 'ওস্তাদ্‌জি' নামের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

তাঁহার একটা প্রিয় খেলা সকল শিশুদেরই বিশেষ কৌতুকপ্রদ ছিল। বালক যতীন্দ্রমোহন ক্যাঙ্গারু সাজিয়া সম্মুখের দুইটি হাত বুকের কাছে বাঁকাইয়া ধরিয়া মুখ সরু করিয়া এবং পা দুইটি একত্র করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া আগে আগে চলিতেন, আর শিশুর দল সানন্দ কলরবে পিছনে পিছনে তাঁহার অনুকরণ করিত। তখন কে জানিত, যে-বালক ক্যাঙ্গারু সাজিয়া শিশুর দলকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে, তিনিই একদিন ভারত-বরেণ্য দেশপ্রিয় নেতা রূপে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত করিবেন ? তখন কে ভাবিয়াছিল, ক্ষুদ্র বালকদলের দেওয়া এই 'ওস্তাদ্‌জি' আখ্যাই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার যথার্থ পরিচয়-স্বরূপ হইবে ?

যতীন্দ্রমোহন সন্তরণেও খুব নিপুণ ছিলেন। তিনি ছেলে-বেলায় সাঁতারের বাজী জিতিয়া একটি ছাগল লাভ করেন, ও বন্ধু-বান্ধবদের সহিত মিলিয়া মহানন্দে উহা রন্ধন ও ভোজন করেন।

উচ্চশিক্ষা ও বিলাত যাত্রা

১৯০২ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন হেয়ার স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পিতা তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বাক্‌পটুতা বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এবং আইন-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিলে তিনি যে একজন কৃতী ব্যবহারজীবী হইতে পারিবেন, দূরদর্শী পিতা তখনই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, যতীন্দ্রমোহন আইন-ব্যবসায়ী হন। পিতার এই ইচ্ছাকেই শিরোধার্য্য করিয়া স্বগ্রামবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন এম্-ডি, এফ-আর-সি-এস্ মহোদয়ের সহিত যতীন্দ্রমোহন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২৫শে আগষ্ট তারিখে বিলাত যাত্রা করেন।

চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ এণ্ডারসন্ ও মিঃ ডিক্‌সন তখন বিলাতে ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই যতীন্দ্রমোহনকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন; কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধ অপেক্ষা পিতার আন্তরিক অভিলাষের মর্য্যাদাই তাঁহার নিকট বেশী মূল্যবান্ মনে হইল। তাই সিভিলিয়ান্ হওয়ার প্রলোভন তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না।

বিলাতে পৌঁছিবার কিছুদিন পরে তিনি কেম্ব্রিজের ডাউনিং কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯০৭ সালে ট্রাইপোজের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পরের বৎসর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি লাভ করেন এবং ১৯০৯ সালে আইনের ট্রাইপোজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল্-এল্-বি

উপাধি-ভূষিত হন। সেই বৎসরই ২৩শে জুন তারিখে তিনি লণ্ডন 'গ্রেজ্ ইন্' হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া বাহির হন।

ক্রীড়ানুরাগ ও নেতৃত্ব

কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালেও স্বীয় অমায়িক ব্যবহার ও স্বভাবের মাধুর্য্যে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আপন সঙ্গিদল গঠন করিয়া লন। শৈশবেই তাঁহার মধ্যে যে নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, এখানে ক্রমেই তাহা বিকশিত হইতে থাকে। তিনি যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন 'ভারতীয় মজলিস' ও 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমিতি'র সভাপতি ছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন শৈশবাবধিই খেলাধূলার ভক্ত ছিলেন। নিতান্ত সুবোধ ও সুশীল ছেলেটির মত ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া বই মুখস্থ করিয়া পাশ করা অপেক্ষা বাহিরের মুক্ত আলো-বাতাসে নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুকে যোগদান করাই তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। বিলাতে অবস্থানকালে তাঁহার এই ক্রীড়াশক্তি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তথায় তিনি ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ও নৌ-চালনায় সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই ক্রীড়াশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। সারাদিনের কাজের শেষে সভা-সমিতির হট্টগোল, রাজনীতির কূট তর্ক, আইনের জটিলতা, কর্পোরেশনের কলরব ইত্যাদি দূরে রাখিয়া তিনি যখন শ্রান্ত দেহে স্বগৃহে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিতেন, তখন রাজনীতিক নেতা ও আইনজ্ঞ যতীন্দ্রমোহনকে সম্পূর্ণ অন্যরূপে দেখা যাইত। তাঁহার মুখে তখন হাসির কথা, আনন্দের কথা,

ক্রীড়া-কৌতুকের কথা। দলীপ সিং এবং পাতৌদির নবাবের মধ্যে কে বড় খেলোয়াড়, মোহন বাগান ও ইষ্ট বেঙ্গলের মধ্যে কে কোন্ দিন ভাল খেলিয়াছে, গোষ্ঠ পাল আর কত দিন খেলিতে পারিবে, কার্ত্তিক গণেশ কোন্ টিমে খেলিবে, সাউথ ক্লাব এবং লেক ক্লাবের কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে শিশির ভাদুড়ীর দান কতখানি—ইত্যাদি বহুমুখী ও বিচিত্র আলোচনা-সমালোচনায় তাঁহার গৃহ তখন হাস্য-কোলাহল-মুখর হইয়া উঠিত।

খেলাধূলার আলোচনায় তিনি এক একদিন এমন মত্ত হইয়া উঠিতেন যে, আপন পুত্রদের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক-বিতর্ক করিতেও বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। একদিন এম্‌নি তর্ক করিতে করিতে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। সেদিন বিলাতে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সুবিখ্যাত নৌচালন-প্রতিযোগিতা হইবার কথা। বিলাতে পাঠ্যাবস্থায় যতীন্দ্রমোহন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বোট্ ক্লাবের' বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং নৌ-চালনে দক্ষতা দেখাইয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তাই উক্ত প্রতি-যোগিতার ফলাফল জানিবার অত্যধিক আগ্রহে তিনি রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত বিলাতী সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান রয়টারের কলিকাতা-অফিসে সাত-আট বার টেলিফোন করিলেন।

তখন পর্য্যন্ত বিলাত হইতে উক্ত প্রতিযোগিতার ফলা-ফলের সংবাদ আসে নাই। এদিকে ফলাফল জানিবার দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ, অন্যদিকে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি। শুইতে খাইতেও ইচ্ছা করিতেছে না, অথচ বসিয়া থাকাও আর শরীরে কুলাইতেছে না। তিনি তখন তাঁহার এক

অনুগত শিষ্য ও সহকর্ম্মীকে টেলিফোনের নিকট বসাইয়া শয়ন করিতে গেলেন এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন, সংবাদ আসিলেই যেন তাঁহাকে জানান হয়। রাত্রি একটার সময় খবর আসিল, কেম্ব্রিজেরই জয় হইয়াছে। তখনই ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে এ সংবাদ জানান হইল। তিনি এ সংবাদে এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন যে, তখনই বাড়ীশুদ্ধ সকলকে জাগাইয়া এ খবর দিলেন এবং বাকী রাতটুকু আর কাহাকেও ঘুমাইতে দিলেন না।

বিবাহ

বিলাতে পাঠাভ্যাস-কালে ১৯০৯ সালে যতীন্দ্রমোহন নেলী গ্রে নাম্নী এক ইংরেজ কুমারীর সহিত পরিচিত হন এবং অবশেষে তাঁহাকে বিবাহ করেন। তিনিই এখন মিসেস্ নেলী সেনগুপ্তা নামে সমগ্র ভারতে সুপরিচিতা। বিদেশিনী মহিলা হইয়াও তিনি তাঁহার স্বামীর জন্মভূমিকেই স্বদেশ বলিয়া ভালবাসিতে শিখেন এবং বিবাহের পর হইতে স্বামীর পাশে পাশে থাকিয়া ভারতের মঙ্গল-কামনায় সমুদয় দুঃখকষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। যথার্থ সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তিনি সকল কাজেই যতীন্দ্রমোহনের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং এজন্য একাধিকবার কারাবরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বাস্তবিক, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা ইংরেজ-দুহিতা হইয়াও আজ ভারতের পরম গৌরব ও গর্ব্বের ধন।

যতীন্দ্রমোহনের এই বিবাহেও তাঁহার বলিষ্ঠ মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি যে সময় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখনই তাঁহাদের বিবাহের

কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হয়। দেশে ফিরিয়া আত্মীয়-স্বজনের মত নিয়া বিবাহ করিবেন এই বোধ হয় যতীন্দ্রমোহনের প্রথম সঙ্কল্প ছিল। তাই তিনি বিবাহ স্থগিত রাখিয়া দেশে রওনা হন। কিন্তু দেশে কেহ এই বিবাহে বাধা দিলে এই সরলা বালিকার প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে—এই ভাবিয়া তিনি এডেন হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং নেলী গ্রের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই অসামাজিক বিবাহে দেশের সমাজে ও আত্মীয় মহলে যে এক মহা গোলযোগের সৃষ্টি হইবে, তাহা যতীন্দ্রমোহনের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তিনি যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা হইতে এক চুলও বিচলিত হইতেন না।

যতীন্দ্রমোহন যখন স্ত্রীকে তাঁহার সমুদয় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় তাঁহার মাসীমার বাসায় আসেন, তখন অনেকে তাঁহাকে শঙ্কা ও সঙ্কোচের সহিত গ্রহণ করায় তিনি গভীর বিশ্বাসে বলিয়াছিলেন, "যে যাহাই বলুক, আমি জানি, আমি ভুল করি নাই। আমি আমার জীবনের যথার্থ সঙ্গিনীই লাভ করিয়াছি।"

যতীন্দ্রমোহন যে সত্যই ভুল করেন নাই, আজ এই বিদেশিনী নারীর অতুলনীয় পাতিব্রত্য ও স্বামীর জীবনাদর্শকে নিজের জীবনে সুপরিস্ফুট করিবার ঐকান্তিকী চেষ্টা দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

ব্যারিষ্টারী

১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে যতীন্দ্রমোহন দেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করিলেন।

অতি অল্পকালমধ্যেই ফৌজদারী মামলায় তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বাংলার বাহির হইতেও তাঁহার ডাক পড়িতে থাকে। ভাগ্যলক্ষ্মীর করুণাও তাঁহার উপর অকৃপণ ভাবে বর্ষিত হইতে থাকে।

আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াও তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ খেলাধূলার অভ্যাস বর্জ্জন করেন নাই। তিনি হাই-কোর্ট ক্লাবের ক্যাপ্টেন এবং বেঙ্গল টেনিস ক্লাবের একজন সুদক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন ব্যারিস্টারী করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অর্থের মায়ায় তিনি কোন দিনই কর্ত্তব্যকে ছোট করিয়া দেখেন নাই। অর্থে অনাসক্তি তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কাউন্সিলের জন্য যে তিনি কত সময় কত মামলা ছাড়িয়া দিয়া নিজের আর্থিক ক্ষতি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা ছাড়া, বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধ-উপরোধ রাখিতে গিয়াও অনেক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

আসাম-বেঙ্গল ধর্ম্মঘট পরিচালনার ব্যয়ভার বহনের ফলে যতীন্দ্রমোহনের তখন বহু সহস্র টাকা ঋণ। এমন সময় বোম্বের বিখ্যাত বাওলা-মোকদ্দমা তাঁহার হাতে আসিল। বাংলা কাউন্সিলে তখন মন্ত্রীর বেতন লইয়া ভয়ানক গোলযোগ চলিতেছে। বোম্বেতে যে দিন বাওলা-মামলার শুনানীর তারিখ, ঠিক সেই দিনই কাউন্সিলে মন্ত্রীদের বেতন নাকচ করিবার বিল উপস্থিত করার কথা। যতীন্দ্রমোহন বোম্বে চলিয়া গেলে কাউন্সিলে তাঁহার পক্ষীয় স্বরাজ্য-দলের একটি ভোট কমিয়া যাইবে; তাহার অর্থ, হয়ত স্বরাজ্য-দলের পরাজয়।

যতীন্দ্রমোহন মুহূর্ত্তে সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। বোম্বেতে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়া দিলেন, মামলা এক সপ্তাহ মুলতুবী না থাকিলে তাঁহার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। সে অবস্থায় তাহারা যেন অন্য ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করে।

এত বড় মামলা! বহু সহস্র টাকা ফিস্ পাওয়ার কথা। এই এক মোকদ্দমার ফিসেই তিনি ঋণমুক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের নিকট তিনি নিজের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি গণনার মধ্যেই আনিলেন না।

পরদিন সেনগুপ্তের টেলিগ্রামের জবাব আসিল—"মামলা মুলতুবী রাখা সম্ভব নয়। তাঁহাকে যাইতেই হইবে।"

কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের মত পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাঁহার এক সহকর্ম্মী তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এ সংবাদ জানাইলেন। দেশবন্ধু স্বয়ং যতীন্দ্রমোহনের বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এ মামলায় তাঁহার যাওয়াই সঙ্গত।

কিন্তু তবুও যতীন্দ্রমোহন তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্পেই স্থির রহিলেন। আবার তার করা হইল, তিনি এ তারিখে কিছুতেই যাইতে পারিবেন না। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কলিকাতার অন্য কোন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে পারেন।

রাত্রি তখন আটটা। এত বড় একটা মামলা হাতছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া বাড়ীর সকলের মুখই বিষাদ-মলিন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন নিজে নির্ব্বিকার। কিছুক্ষণ পর টেলিগ্রামের জবাব আসিল,—তাঁহারা সেনগুপ্তকেই চান, মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

আর একবারের ঘটনা। একটা বড় মামলা হাতে পাইয়াছেন। দুই সপ্তাহকাল মামলা চলিবে এবং প্রায় দশ

হাজার টাকা ফিস্ পাইবেন। সেদিনই বিকালে তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া ধরিলেন, তাঁহার (বন্ধুর) এক ভাইয়ের চাকুরী-সংক্রান্ত একটা মামলার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তাঁহাকে দার্জ্জিলিং যাইতে হইবে।

যতীন্দ্রমোহন নিজের অসুবিধার কথা বলিলেন। কিন্তু বন্ধু যখন তবুও ছাড়িলেন না, তখন টাকার মামলা ছাড়িয়া দিয়া তিনি বিনা পয়সায় বন্ধুর ভাইয়ের মামলা করিয়া আসিলেন। এভাবে এক মুহূর্ত্তের সিদ্ধান্তে তাঁহার যে দশ হাজার টাকা হাতছাড়া হইল, তাহা তিনি গ্রাহ্যই করিলেন না।

রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ

ব্যারিষ্টারী জীবনের সূত্রপাত হইতেই যতীন্দ্রমোহন রাজনীতি-চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১১ সালে ফরিদপুরে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়, তিনি উহাতে উপস্থিত থাকিয়া সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশনকে স্বীয় জন্মভূমি চট্টগ্রামে আহ্বান করেন এবং উহাতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯১৯ সালে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, যতীন্দ্রমোহনের পিতা যাত্রামোহন তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য বশতঃ তিনি স্বয়ং তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে অসমর্থ হওয়ায় যতীন্দ্রমোহন উহা পাঠ করেন। সেদিন সেই জাতীয় সম্মেলনের পবিত্র বেদীমূল হইতে তিনি জলদ-গম্ভীর অথচ আবেগময় কণ্ঠে পিতার জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি, আমার স্বদেশপ্রেম অন্য কাহারও অপেক্ষা এক বিন্দু

কম নয়, এবং দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে আমি অন্য কাহারও নিকট হার মানিব না।"

পরবর্ত্তী কালে কর্ম্মের দ্বারা তিনি সেই বাণীকে নিজের জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে দেশবন্ধু দাশ, মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অনুকূলে যে প্রস্তাব আনয়ন করেন, অনেকেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও যতীন্দ্রমোহন দেশবন্ধুকেই সমর্থন করেন।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯২১ সালে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হইল। গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গাঘাতে সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিল। যতীন্দ্রমোহন সেই তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সেই সময় হাইকোর্টে তাঁহার যথেস্ট সুনাম-প্রতিপত্তি, আয়ও বেশ প্রচুর। কিন্তু দেশের আহ্বানে তিনি সে সমুদয় মৃত্তিকাখণ্ডের মত পরিত্যাগ করিলেন। তখন পর্য্যন্ত তিনি এমন কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই যাহাতে পরিবার-প্রতিপালন হইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও তিনি বিচলিত হইলেন না, হাসিমুখে নিশ্চিত দারিদ্র্য বরণ করিয়া তিনি দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এ সময় তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণ দারিদ্র্যের যে কি কঠোর নিষ্পেষণ হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবেরাই জানেন! অবশেষে দারিদ্র্যের জ্বালায় তিনি আবার ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনদিনই তাহাতে একান্তভাবে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। ব্যারিষ্টারী ছিল তখন পেটের দায়, কিন্তু রাজনীতি ও দেশসেবাই ছিল তাঁহার প্রাণের আহ্বান।

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ধর্ম্মঘট

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর শ্রমিকগণ নিজেদের শোচনীয় দুরবস্থার প্রতিকার-কল্পে ধর্ম্মঘট করে। যতীন্দ্রমোহনের হৃদয় তাহাদের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল; তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে ছুটিয়া গেলেন।

যতীন্দ্রমোহনের সভাপতিত্বে চট্টগ্রামে তখন জেলা-কংগ্রেস কমিটির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া তথায় কোন প্রকার সভা-সমিতি বা শোভাযাত্রা করিতে তাঁহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিলেন। কিন্তু নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা যতীন্দ্রমোহন সে আদেশ অমান্য করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। ৪ঠা মে তারিখে চট্টগ্রাম সহরে হরতাল প্রতিপালিত হইল। সমস্ত সহর একবারে নিস্তব্ধ; দোকান-পাট, হাট-বাজার, কলের জল, সওদাগরী অফিস—সব বন্ধ; সরকারী কাছারীতে উকিল-মোক্তারের দেখা নাই; মেথর-মালী. বাবুর্চ্চি-খানসামা, কুলি-গাড়োয়ান সব হাত গুটাইয়া বসিল—অর্দ্ধপথে রেল থামিয়া গেল। কর্ম্ম-মুখর নগরী যেন যাদুকরের মায়াদণ্ড-স্পর্শে একেবারে নীরব হইয়া গেল!

গতিক সুবিধার নয় দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অবশেষে আপোষ করিতে সম্মত হন এবং বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজার ধর্ম্মঘটকারীদের সমস্ত দাবী মানিয়া নিতে স্বীকৃত হন। এভাবে ধর্ম্মঘটের অবসান এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বিজয় ঘোষিত হইল।

আসাম-বেঙ্গল রেল-ধর্ম্মঘট

ইহার পরই যতীন্দ্রমোহন আসাম-বেঙ্গল রেল-ধর্ম্মঘটের

সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেন। এ সময় তিনি যে ত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে আসামের চা-বাগানের কুলিরা দেশে চলিয়া যাওয়া স্থির করে। প্রথমতঃ তাহাদিগকে এ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে বহু চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় করিমগঞ্জের ষ্টেশন-মাষ্টার তাহাদিগকে টিকিট দিতে অস্বীকার করেন। উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাহারা বাধ্য হইয়াই চা-বাগানের কাজে থাকিয়া যাইবে।

যতীন্দ্রমোহন তখন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের এজেণ্ট ও ট্র্যাফিক ম্যানেজারকে টিকিট দিবার জন্য টেলিগ্রাম করেন। তদনুযায়ী ৪০০০ কুলী চাঁদপুর পর্য্যন্ত আসিয়া পোঁছে। কিন্তু এখানে তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার হওয়ায় তাহার প্রতিবাদে ২১শে মে চাঁদপুরে হরতাল ঘোষণা করা হয়। চাঁদপুর ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা এই হরতালে যোগদান করার অপরাধে দণ্ডিত হয়। তাহার ফলে চট্টগ্রাম হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত রেল-লাইনের কেরাণী ও শ্রমিক মিলিয়া প্রায় ২৪০০০ লোক ধর্ম্মঘট করে। এই ধর্ম্মঘট তিন মাসের ঊর্দ্ধকাল স্থায়ী হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন এই ধর্ম্মঘটের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মঘটকারীদের ভরণ-পোষণের জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া অবশেষে নিজের স্কন্ধে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণের বোঝা গ্রহণ করেন।

গুণমুগ্ধ দেশবাসী যতীন্দ্রমোহনের এই মহাপ্রাণতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে **দেশপ্রিয়** আখ্যায় বিভূষিত করিল। চট্টগ্রামের মুকুট-মণি সমগ্র বাংলার হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রথম কারাবরণ

অসহযোগ আন্দোলন ক্রমেই শক্তিলাভ করিতেছে দেখিয়া চট্টগ্রামে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া গভর্ণমেণ্ট সমস্ত সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দেন। উক্ত আদেশ অমান্যের ফলে নয়জন কংগ্রেস-কর্ম্মী গ্রেপ্তার হন। যতীন্দ্রমোহন তখন চট্টগ্রাম জিলা-কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে ঘোষণা করেন যে, তিনি ধৃত কংগ্রেস-কর্ম্মীদের জন্য দেবালয়ে গিয়া প্রার্থনা করিবেন। যাঁহাদের ইচ্ছা, তাঁহারা ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন।

দেশপ্রিয়ের ঘোষণা-বাণী শুনিয়া দলে দলে লোক তাঁহার নিকট সমবেত হইতে থাকে। তিনি তাহাদের পুরোভাগে থাকিয়া এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়া চলিলেন। উহা প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিলে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ-সাহেব আসিয়া বাধা দিলেন এবং যতীন্দ্রমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি এই শোভাযাত্রার নেতা ?"

যতীন্দ্রমোহন নির্ভীক হৃদয়ে গর্ব্বিত স্বরে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।"

তখন তাঁহারা তাঁহাকে শোভাযাত্রা ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন তাহাতে অসম্মত হইলে, পুলিশ ১৭ জন কংগ্রেস-কর্ম্মীর সহিত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে লইয়া গেল। ২০শে অক্টোবর তাঁহাদের বিচার হইল এবং বিচারে যতীন্দ্রমোহন-প্রমুখ সকলেই তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

যতীন্দ্রমোহনের কারাদণ্ডে চট্টগ্রামবাসী এত বিক্ষুব্ধ হইল এবং দলে দলে এমন ভাবে বিক্ষোভ দেখাইতে লাগিল যে,

কর্ত্তৃপক্ষ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া সেই দিনই তাঁহাদিগকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

ব্যবস্থাপক সভায়

দণ্ড-ভোগান্তে যতীন্দ্রমোহন কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পর মহাত্মা গান্ধী রাজদ্রোহের অপরাধে ধৃত ও ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার ফলে অসহযোগ আন্দোলনের গতিবেগ মন্দীভূত হইয়া আসে। এদিকে ধনী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির আশায় কাউন্সিল ও এসেম্ব্লিতে প্রতিনিধি সাজিয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে ব্যস্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন স্বরাজ্য-দল গঠন করিয়া ইহাদের চেষ্টায় বাধা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। যতীন্দ্রমোহন সেই দলে যোগদান করিয়া কাউন্সিলের সদস্য-পদপ্রার্থী হন। সে সময় তিনি এত ভোট পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন বাংলার মুকুটহীন রাজা। তাঁহার নেতৃত্বে যতীন্দ্রমোহন কাউন্সিল ও কর্পোরেশনে বিপুল উদ্যমে কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং স্বীয় অমায়িক স্বভাবের গুণে শত্রু-মিত্র সকলের সমান প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনিই বঙ্গীয় কাউন্সিলে স্বরাজ্য-দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

বাংলার ত্রি-মুকুট

অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন দেশবন্ধুর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

প্রশ্ন উঠিল, দেশবন্ধুর পরিত্যক্ত ত্রি-মুকুট কে ধারণ করিবে? কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, স্বরাজ্য-দলের নেতা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি—এই ত্রিবিধ দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত পালন করিতে পারেন বাংলায় তেমন নেতা কই? মেয়রের সোনার মুকুটের জন্য প্রার্থীর অভাব হইল না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বলিলেন, এই ত্রি-মুকুট এক জনকেই ধারণ করিতে হইবে, এবং তিনি যতীন্দ্রমোহনকেই যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া মনোনীত করিলেন।

এই সৌধ-কিরীটিনী কলিকাতা মহানগরীতে যাঁহার এক খানাও বাড়ী নাই, ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে যাঁহাকে বাস করিতে হয়, তাঁহাকে এই মহানগরীর মেয়র-পদে নির্ব্বাচন! ইহাতে বহু লোকই গান্ধীজির উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কিন্তু মহাত্মাজী তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ যুক্তিতর্ক দ্বারা অনায়াসেই বিরোধী পক্ষের মুখ বন্ধ করিয়া দেন, এবং দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন যে, ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর নির্ব্বাচন সম্ভবপর ছিল না। মহাত্মার দূরদৃষ্টি যে যোগ্যতম লোকের উপরই পতিত হইয়াছিল, যতীন্দ্রমোহনের পরবর্ত্তী কার্য্য-কলাপে তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে।

ফ্ল্যাট মেয়র

যতীন্দ্রমোহন পাঁচবার কলিকাতা মহানগরীর মেয়র নির্ব্বাচিত হন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ১৯২৫ সনে তিনি মেয়র-পদে অধিষ্ঠিত হন। তৎপর ১৯২৬ সালে দ্বিতীয়বার, ১৯২৭ সালে তৃতীয়বার, ১৯২৯ সালে চতুর্থবার এবং ১৯৩০ সালে পঞ্চম ও শেষবার মেয়র নির্ব্বাচিত হন। পঞ্চমবার নির্ব্বাচনের বিশেষত্ব এই যে—যতীন্দ্রমোহন তখন কারারুদ্ধ। ইহাতেই তাঁহার জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মেয়র-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যতীন্দ্রমোহন দেশবন্ধুর কার্য্য-পন্থাই গ্রহণ করেন এবং এই মহানগরীর কতকগুলি উন্নতি সাধন করেন। কর্পোরেশনের কার্য্য-পরিচালনায় তিনি শত্রু-মিত্র সকলেরই প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যশোবিস্তার

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে-ধর্ম্মঘট পরিচালনার পর হইতেই যতীন্দ্রমোহনের নাম বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে তিনি সমগ্র ভারতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কংগ্রেসেও তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননেতা হিসাবে ভারতের বিভিন্ন নাগরিক প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে মানপত্র দানে সম্বর্দ্ধনা করেন।

১৯২৬ সালে কানপুরে কংগ্রেসের সময় কানপুর মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। ১৯২৭ সালে মান্দ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান করিতে গেলে মান্দ্রাজ কর্পোরেশন তাঁহাকে এক মানপত্র প্রদান করেন। সেই কংগ্রেসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের গৌরব তিনিই লাভ করিয়াছিলেন। করাচী মিউনিসিপ্যালিটিও তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন।

১৯২৮ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বসিরহাট সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সে বৎসর তিনি কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, কেরল প্রাদেশিক কনফারেন্সেও তিনি সভাপতিত্ব করেন।

কংগ্রেসের সভাপতি-পদের জন্যও তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অনুকূলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অকুন্ঠিত দেশসেবা, অনন্যসাধারণ ত্যাগ ও চরিত্রের মাধুর্য্যে ভারতের বাহিরেও তাঁহার যশোবিস্তার হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় জাতীয় মহাসভা যতীন্দ্রমোহনকে বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল ; কিন্তু পারিবারিক কারণে তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার দশম বার্ষিক অধিবেশনেও তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

জাতীয় পতাকা

১৯৩০ সনের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন তখন রোগ-শয্যায় শায়িত। তবুও বাংলার তরুণগণের আহ্বানে তিনি রোগশয্যা পরিত্যাগ করিয়া দেশ-বন্ধু পার্কে জাতীয় পতাকা হস্তে উপস্থিত হইয়া বজ্রনির্ঘোষে সমবেত জনমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, “তরুণ তেজে উদ্দীপ্ত হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! তোমাদেরই মুখ চাহিয়া আজ আমি রোগশয্যা হইতে উঠিয়া এই মহান্ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া ধন্য হইলাম। যদি ভাগ্যদোষে কর্ম্ম-বিড়ম্বনায় আমাদের মধ্যে কাহারও হস্ত এই পতাকা বহন করিতে কম্পিত হয়, তাহা হইলে তাহা যেন স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাক্য সহ পরবর্ত্তিগণের হস্তে প্রদান করিয়া যাই।”

আবার কারাবরণ

১৯৩০ সনের প্রথম ভাগেই যতীন্দ্রমোহন শারীরিক অসুস্থ হইয়া পড়ায় চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সমুদ্র-ভ্রমণের উপদেশ দেন। তদনুযায়ী তিনি সস্ত্রীক সিঙ্গাপুর যাত্রা

করেন। সিঙ্গাপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি রেঙ্গুনে অবতরণ করেন।

তখন ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। এ আন্দোলন যে ভারতের জাতীয়তার পক্ষে ঘোর অনিষ্টজনক, তৎসম্পর্কে যুক্তি দেখাইয়া তিনি ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রেঙ্গুনে দুইটি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহার বিরুদ্ধে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়।

ইতিমধ্যে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ১৩ই মার্চ্চ তারিখে তাঁহার এলগিন রোডস্থ ভবন হইতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রেঙ্গুনে লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতার 'প্রথম নাগরিক'কে সম্মান দেখাইবার জন্য সেদিন আউটরাম ঘাটে বহুলোক সমবেত হয়।

জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন:—"মায়ের আহ্বানে মুক্তি-সমরে প্রতিপক্ষ-কর্ত্তৃক আমি বন্দী। এ বন্দিত্বের আনন্দ একমাত্র বন্দীরই অনুভব্য। মাতৃযজ্ঞের বোধন শঙ্খ-ধ্বনি-নিনাদে সমগ্র ভারতবর্ষ জাগরিত হইয়াছে। মাতৃমন্ত্রের সিদ্ধ ঋষি আজ মায়ের অর্চ্চনার অর্ঘ্য সাজাইবার জন্য তাঁহার অহিংস বাহিনী লইয়া বিজয় যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অভিনব অভিযান। একদিকে বৈজ্ঞানিক আয়ুধাদি-সুসজ্জিত সুশিক্ষিত বিরাট্ বাহিনী,—অন্যদিকে চিরলাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত, অন্যায় ও অবৈধ করভারে প্রপীড়িত, নিরন্ন, নিরস্ত্র, নিরক্ষর জনসাধারণ। এমন মহিমময় অদ্ভুত সমরায়োজন অভূতপূর্ব্ব। স্বাধীনতার এই মহাযজ্ঞে সমগ্র ভারতবাসীকে আহুতি সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞেশ্বর ঐ ডাকিতেছেন—'কে কোথায় মাতৃস্তন্যপায়ী

সন্তান আছ, ছুটিয়া আইস, মাতৃপূজার মহাবলির সময় আগত। এই উদাত্ত আহ্বানে ভারতের রাজনীতিক পথ-প্রদর্শক আমার চির-আদরের বাংলা কখনও পশ্চাতে থাকিবে না। বাংলার আবাল-বৃদ্ধ নরনারী সকলেই উন্মত্ত হইয়া মহাত্মার পতাকাতলে সমবেত হও।”

১৭ই মার্চ্চ রেঙ্গুনে পৌঁছিলে এক বিরাট জনতা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করে। তৎপর স্থানীয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহার দশ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

দণ্ড-ভোগান্তে তিনি ৩রা এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, আউটরাম ঘাটেই গুণমুগ্ধ কলিকাতাবাসী স্বাধীনতার এই নির্ভীক সাধককে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য দলে দলে সম্মিলিত হইয়াছিল।

আইন-অমান্য-আন্দোলন

সেই বৎসরই কলিকাতা কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে এক সভায় রাজদ্রোহ-সূচক পুস্তক পাঠ করিবার ফলে তিনি পুলিশ-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিচারের সময় তিনি কোনরূপ অংশ গ্রহণ করেন নাই, এমন কি প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তখন আইন-অমান্য-আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ পর পর ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইতে থাকেন। কংগ্রেসের তদানীন্তন ও ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্টগণও কারাবরণ করেন।

যতীন্দ্রমোহন জেল হইতে বাহির হইয়াই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন এবং পূর্ণ উদ্যমে আইন-অমান্য-আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ২৫শে অক্টোবর তারিখে তিনি পুলিশের নিষেধ অমান্য করিয়া জালিয়ানওয়ালা-বাগে বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে দিল্লীর অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট-কর্ত্তৃক ৩রা নভেম্বর তারিখে রাজদ্রোহের অপরাধে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাহার পরদিনই সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারেই শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাও চারি মাসের জন্য কারাদণ্ড লাভ করেন।

অনন্তর ১৯৩১ সালে গোল-টেবিল-বৈঠকে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা আলোচনার সুযোগ দিবার জন্য ২৬শে জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যদিগেরই মুক্তি-বিধান করা হয়। সে সময় যতীন্দ্রমোহনও মুক্তি লাভ করিয়া ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সস্ত্রীক কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল জন-সমাবেশ হয়। গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্ল্যাট্‌ফরম লোকে লোকারণ্য হইয়া যায় এবং দর্শনাকুল জনতার চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এ সময় ষ্টেশনে প্ল্যাট্‌ফরমে এক মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে প্রথম দেখিবার ব্যাকুল আগ্রহে সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গাড়ীর পা-দানি হইতে পড়িয়া গিয়া সাংঘাতিক আহত হন এবং হাওড়া হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাঁহার মুখে একই কথা!— "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে দেখিতে পারিলাম না, ইহাই আমার দুঃখ রহিল।"

এ সংবাদ শুনিয়া যতীন্দ্রমোহন সস্ত্রীক হাওড়া হাসপাতালে উপস্থিত হন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে যে শোকসভা হয়, তাহাতে যতীন্দ্রমোহন অশ্রু-বিগলিত স্বরে বলিয়াছিলেন, "এই বীর যুবক আমাকে সম্মান দেখাইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে যান নাই। দেশপ্রেমের প্রেরণায় তিনি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞের পুরোহিতদিগের সম্মানই দেখাইয়া গিয়াছেন। বড় দুঃখ রহিল, ইহলোকে এই বীর-পূজারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু বিশ্বাস করি, এ জগতের পর-পারে বসিয়াও তিনি আমাদের সহিত একাত্মতা বোধ করিতেছেন।"

চট্টগ্রাম ও হিজলী

বড়লাট ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে আলোচনার ফলে ১৯৩১ সনের ৫ই মার্চ্চ তারিখে গান্ধী-আরুইন-চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তাহার ফলে আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। গভর্ণমেণ্টও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান প্রভৃতি কতকগুলি সর্ত্ত স্বীকার করিয়া লন।

তৎপর করাচী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের প্রতিনিধি-হিসাবে দ্বিতীয় গোল-টেবিল-বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বিলাত যাত্রার পরদিনই চট্টগ্রামে একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ইহার ফলে চট্টগ্রাম সহরে লোমহর্ষণ কাণ্ড উপস্থিত হয়।

ইতিমধ্যে হিজলী বন্দীনিবাসেও এক মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার ঘটে। তথায় সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নামে দুইজন

রাজবন্দী পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই উভয় ঘটনায় দেশে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়।

বিলাত যাত্রা

এ সময় রক্তের চাপ বৃদ্ধি-হেতু যতীন্দ্রমোহনের স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়ে। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ এবং সমুদ্র-যাত্রার উপদেশ দেন। চিকিৎসকগণের উপদেশে এবং বাংলাদেশের এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সহিত মহাত্মা গান্ধীকে পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে, যতীন্দ্রমোহন ১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসে সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করেন।

প্রায় এক বৎসর তথায় অবস্থানের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হয়। আরও কিছুদিন থাকিলে বোধ হয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াই ফিরিতে পারিতেন। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ।

এদিকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে আবার আইন-অমান্য-আন্দোলন উপস্থিত হইল। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল, সুভাষচন্দ্র বসু-প্রমুখ প্রধান প্রধান কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দ ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন। দেশের এই সঙ্কট-কালে দেশপ্রেমিক দেশপ্রিয় আর বিদেশে থাকিতে পারিলেন না। অনতিবিলম্বে 'গেঞ্জ' নামক ইতালীয় জাহাজে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শেষ বন্দী জীবন

১৯৩২ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখে জাহাজ বোম্বাই-উপকূলে ভিড়িতে না ভিড়িতে তাঁহাকে ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইল। ইটালীয় জাহাজে থাকা

অবস্থায় এইরূপ গ্রেপ্তারে জাহাজের কাপ্তান প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে ফলোদয় হয় নাই।

গ্রেপ্তারের পর তাঁহাকে প্রথমে যারবেদা জেলে লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে তাঁহাকে দার্জ্জিলিং জেলে পাঠান হয়। কিন্তু সেখানে গিয়া তাঁহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহাকে জলপাইগুড়ি জেলে আনয়ন করা হয়। এইখানে তাঁহার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হইয়া পড়ে ; অতঃপর চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু রোগের কোন উপশম না হওয়ায় তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়। এইখানে সাত মাস চিকিৎসায়ও কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে তাঁহাকে রাঁচিতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে তাঁহার পরিবার-পরিজনকে তাঁহার সহিত থাকিতে অনুমতি দেওয়া হয়। রাঁচিতে গিয়া প্রথমে তাঁহার স্বাস্থ্যের একটু উন্নতিই হইতে থাকে ; কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার জ্বর হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কেহই তাহা তত মারাত্মক মনে করে নাই।

মহাপ্রয়াণ

২২শে জুলাই সন্ধ্যায় যতীন্দ্রমোহন মোটরে চড়িয়া বেড়াইয়া আসেন। অতঃপর কিছুক্ষণ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর ৮॥ টার সময় তিনি খুব অসুস্থতা বোধ করিতে থাকেন। তখনই সিভিল-সার্জ্জনকে ডাকা হয় ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সময় বন্দী জীবনের নাগপাশ ছেদন করিয়া যতীন্দ্রমোহনের মুক্তি-কামী আত্মা চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করিল।

বাংলার বুকে বজ্রাঘাত হইল !

কলিকাতায় শোভাযাত্রা

গভীর রাত্রিতে টেলিফোনে কলিকাতায় এই নিদারুণ সংবাদ পৌঁছিল। পরদিন মেঘ-মলিন প্রভাতে সুপ্তোত্থিত নগরী সবিস্ময়ে শুনিল, দেশপ্রিয় আর নাই। বিদ্যুদ্ গতিতে এই শোক-সংবাদ সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সকলের মুখই বিষাদ-মলিন, সকলের মুখেই শোকের ছায়া। সকলের মুখেই শুধু এক কথা—"দেশপ্রিয় নাই, যতীন্দ্রমোহন নাই!"

২৫শে জুলাই তাঁহার শবদেহ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। সহরের সমস্ত লোক তাহাদের স্বর্গগত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ হাওড়া ষ্টেশনে ভাঙিয়া পড়িল। দেশবন্ধু ব্যতীত অন্য কাহারও শব-যাত্রায় এত লোক হয় নাই। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শোভাযাত্রা দিনের শেষে কেওড়া-তলায় আসিয়া পরিসমাপ্ত হইল। জাহ্নবীর তীরে দেশবন্ধুর চিতা-পার্শ্বে যতীন্দ্রমোহনের চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হইল। এইভাবে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে বাঙ্গালী তাহাদের চির-আদরের দেশপ্রিয়কে চিরদিনের জন্য হারাইল।

চরিত্র

বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে যতীন্দ্রমোহনের মত এমন উদার, অমায়িক ও সত্যনিষ্ঠ নেতা খুব কমই দেখা গিয়াছে। হীরকের মত উজ্জ্বল, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তাঁহার চরিত্রে কোন হীনতা বা কপটতার লেশ মাত্র ছিল না। শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তিনি সত্যই ছিলেন 'দেশপ্রিয়'।

যতীন্দ্রমোহন আজীবন ক্রীড়ামোদী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার খেলোয়াড়-মনোবৃত্তি শুধু খেলার মাঠেই আবদ্ধ ছিল না —জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই তিনি এই খেলোয়াড়-মনোবৃত্তি রক্ষা

করিয়া চলিতেন। এইখানেই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—Never hit below the belt,—কোমরের নীচে আঘাত করিও না অর্থাৎ কোন অন্যায় পথ অবলম্বন করিও না।

এমন অনেক লোক ছিল যাহারা যতীন্দ্রমোহনের সহিত সকাল বেলায় চায়ের বৈঠকে বসিয়াছে, চা পান করিয়াছে, জলযোগ করিয়াছে, হাসি-গল্প করিয়াছে—আবার সন্ধ্যা-বেলায়ই যতীন্দ্রমোহনের অতি বড় নিন্দা করিয়া বেড়াই-য়াছে। যতীন্দ্রমোহন ইহা জানিতেন। জানিয়াও তিনি দিনের পর দিন তাহাদের সহিত সমান আদরের সহিত মিশিতেন, তাহাদিগকে ভাল বাসিতেন ও আদর-আপ্যায়ন করিতেন।

এমনি মানুষ ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। যাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভাবে তাঁহার সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন, মানুষ যতীন্দ্রমোহন কত বড় ছিলেন! তাঁহার নিকট ছোট-বড় বিচার ছিল না, সকলের সহিতই তিনি সমান ব্যবহার করিতেন। বন্ধু-বান্ধবের মজলিসে তিনি আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইতেন।

তাঁহাকে নিয়া কেহ কোন ব্যঙ্গ-কৌতুক করিলে তিনি তাহা হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি যখন প্রথম বার মেয়র হন, তখন 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত সেগুলি সযত্নে তাঁহার বৈঠকখানা-ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়া-ছিলেন। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হাসিমুখে বলিতেন, "বড় বুদ্ধিমানের মত ঠাট্টা করেছে, তাই অত যত্ন ক'রে রেখেছি।"

তিনি নিজেও খুব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। সময় সময় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়া খুব কৌতুক করিতেন। একবার তিনি এক প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাড়ী হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময় তাঁহার দুই সহকর্ম্মী উপস্থিত। তিনি পরম গম্ভীরভাবে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ওহে অমুক জায়গায় একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। চল না, তোমরাও যাবে। বেশী দেরী হবে না।"

নির্দ্দিষ্ট গৃহের সম্মুখে গাড়ী থামিলে, গৃহস্বামী যতীন্দ্র-মোহনকে অভ্যর্থনা করিতে আসা মাত্র তিনি সঙ্গী দুই জনকে দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি এদের নিমন্ত্রণ করেননি ব'লে তাঁরা আসতে চাননি। আমি জোর ক'রে ধ'রে এনেছি।"

সঙ্গী দুই ভদ্রলোক ত' একেবারে অপ্রস্তুত! যাহা হৌক, যতীন্দ্রমোহনের প্রাণখোলা হাসির রোলে তাঁহারাও যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

যতীন্দ্রমোহন বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া, বিদেশিনী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াও মনে প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন এবং বাংলা-মায়ের সন্তান বলিয়া গর্ব্ব বোধ করিতেন। তিনি নিজে যেমন আজীবন বাংলা-মায়ের ছেলে ছিলেন, নিজের স্ত্রীকেও তেমনি বাঙ্গালী ঘরের বধূই তৈয়ারী করিয়াছিলেন। একবার তিনি সস্ত্রীক উত্তর কলিকাতায় এক স্বদেশী মেলা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। মিষ্টান্নাদি খাওয়ার পর অপরের থালায় ডালমুট ভাজা দেখিয়া বলিলেন, "কই তোমরা ত' আমাকে ডালমুট ভাজা দাও নাই!"

তখন তাঁহাকে কিছু ডালমুট-ভাজা দিলে তিনি সানন্দে তাহা খাইতে লাগিলেন। সামান্য মুড়ি বা চিঁড়া-ভাজা দিলেও

তিনি পরিতৃপ্তির সহিত খাইতেন। খুব ঝাল তরকারী তাঁহার বেশ প্রিয় ছিল।

দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা ছেলের দলকে তিনি খুব ভালবাসিতেন ও তাঁহাদের কিসে উন্নতি হইবে তাহা ভাবিতেন। একবার এক ব্যায়াম-সমিতির উদ্বোধন-উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, "দেশের যারা আশা, ভবিষ্যৎ যাদের মুখ চেয়ে আছে, সেই শিশু এবং কিশোরদের মানসিক বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ও দৈহিক উন্নতি-সাধনের জন্য এইরূপ ব্যায়াম-সমিতির বহুল প্রচার প্রয়োজন। আমাদের দেশে কিশোরমতি বালকদের অনেকেই এড়িয়ে চলেন। কচি গাছকে যেমন ইচ্ছামত বাঁকানো যায়, কোমলমতি শিশুদের জীবন-পথও তেমনি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। একথা পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহ ও প্রাচ্য জাপান যেমন বুঝেছে, সে রকম আর কেউ বুঝেনি বা বুঝবার চেষ্টাও করেনি। অথচ এই অবহেলিত শিশুদের চরিত্র-কথা এবং কর্ম্মের গুণগানেই ভারতের আকাশ-বাতাস একদিন মুখরিত হইয়াছিল। আজও প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরী, শ্রীদাম-সুদামের কথায় আমাদের জাতির অন্তরাত্মা গর্ব্বে ফুলে উঠে।"

দেশপ্রিয় খুব চমৎকার বক্তা ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ ছিল জলদ-গম্ভীর, যুক্তি ছিল অকাট্য। ভাব এবং ভাষা ছিল অগ্নির মত তেজস্বিনী। বন্যা-বেগের মত সেই আবেগভরা ভাব এবং ভাষা মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তাঁহার বক্তৃতার প্রবাহের সম্মুখে বিপক্ষের যুক্তি তৃণের মত ভাসিয়া যাইত। ব্যারিষ্টারের সবল মস্তিষ্ক এবং দেশপ্রেমিকের বিপুল প্রাণ—

এই উভয়ে মিলিয়া দেশপ্রিয়ের বক্তৃতাগুলি এত চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিত।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার শালপ্রাংশু বিরাট মূর্ত্তি, সুতীক্ষ্ণ নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, কৌতুকোজ্জ্বল অথচ তীব্র দৃষ্টি, প্রাণখোলা দরাজ হাসি ও গৌরবর্ণ দীর্ঘায়ত দেহ লইয়া তিনি যখন বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করিতেন, তখনই শ্রোতাদের উপর তিনি যেন এক মায়াজাল বিস্তার করিতেন।

যতীন্দ্রমোহন বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির নেতা ছিলেন। লাঞ্ছিত বাংলার হৃদয়-বেদনা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন; অন্তরীণ ও বন্দীশালার অন্তরালে বাংলা-মায়ের বুকের ধনদের তিলে তিলে ক্ষয়ের ব্যথা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিত। এই ব্যথাই তাঁহাকে আপনভোলা সন্ন্যাসী সাজাইয়া পথে বাহির করিয়াছিল; এই বেদনাই তাঁহাকে ভোগ-শয্যা হইতে নামাইয়া আনিয়া দেশবাসীর সহিত এক করিয়া দিয়াছিল। তাই তিনি বাঙ্গালীর অন্তর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 'দেশপ্রিয়' হইতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার আয়ত বক্ষ ও পুরুষোচিত বিরাট দেহের মধ্যে ছিল একটা বিপুল উদার প্রাণ! সেই নির্ভীক আপনভোলা প্রাণ কোন দিন লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখিত না, তাহা শুধু সম্মুখের পানে নির্ভয়ে চলিত। তাই দেশপ্রিয় সত্যিকার নেতা হইতে পারিয়াছিলেন।

স্বাধীনতার প্রতি অন্তহীন অনুরাগ, প্রবল সত্যনিষ্ঠা, প্রচণ্ড নির্ভীকতা, ক্লান্তিহীন উদ্যম, আকাশের মত উদারতা, ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতা—এই ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহাকে সকলের বরেণ্য করিয়াছে, মরণের পরও তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

সমাপ্ত